OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 126
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1011 - 1017
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 1011 - 1017
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঘরহীন যাদের ঘুম নেই চোখে

সোমনাথ পাল
Email ID: spal43450@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
অদ্রীশ বিশ্বাস, উদ্বাস্তু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়রি, লীলাবতী, মধুসূদন, দেশভাগ।

Abstract

Discussion

ভূমিকা : অদ্রীশ বিশ্বাস, জন্ম ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ সালে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে। পিতা – মধুসূদন বিশ্বাস। মাতা লীলাবতী। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর। এর পর সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলে শিক্ষকতা। তার পর রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এক সময় চার্লস ওয়ালেস ফেলোশিপ পেয়ে প্যারিসে পাড়ি দেন। রোম, ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন। অদ্রীশ কঠিন, আবেগ প্রবণ, অভিমানী, রাজনীতি সচেতন। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অগাধ ধারণা ছিল। সাহিত্যের জগতে তাঁর ছিল অবাধ বিচরন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন শিক্ষক। জগৎ ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাঁর গভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে উপস্থিত। তাছাড়া তাঁর পরিশীলিত কাব্যিক বাণীভঙ্গি, শব্দচয়নে রুচিশীলতা, জীবন ও জগতকে দেখার নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যের গঠনশৈলীতে ঋজুতা তাকে আদর্শ একজন প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকের মর্যাদা দিয়েছে।

সাহিত্যিক ও গবেষক মানুষটির সাথে বিশেষ দিনের পত্রিকা, ডাকটিকিট জমানোর পাশাপাশি অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে রাখা ছিল শখ। এছাড়া দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও ছবি সংগ্রহ করতেন তাঁর নিজের বাড়ির সংগ্রহশালায়। সাহিত্যিক, গবেষক এই দীপ্ত মানুষটি ছিলেন যুগ ও শিল্প সচেতন। ভাব ভাষা বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, চিঠি একদিকে যেমন মানবিকতাবোধে উজ্জ্বল অন্যদিকে তেমনি অস্থির সমাজ ব্যবস্থায় নানা অসঙ্গতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ স্বরূপ নিঃসন্দেহে। দুঃসাহসী, অকপট, আনপ্রেডিক্টেবল, যা মনে করেছেন তাই লিখেছেন। শুধু বিতর্কিত নয়, একইসঙ্গে গভীর, মননশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত। ১৯৬৮ সালে বাঙালি মেয়ের প্রথম বাংলা ভাষায় লেখা উপন্যাস 'মনোত্তমা' ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্পাদনায় বইটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে পুনঃমুদ্রণ হয়।

নিরন্তর পথ চলায় মানবিক প্রত্যয় ও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য সচেতনতায় দুই বাংলার নানা মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা, অনলাইন ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'বটতলার বই' (দুখণ্ড), বাঙালি ও বটতলা (দুখণ্ড), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়রি, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ। পেয়েছেন একমাত্র পুরস্কার লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি প্রদত্ত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 126
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1011 - 1017
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই উপন্যাস একটি সাধারণ মেয়ের কাহিনী। দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলায় সম্পত্তি ছেড়ে একদম নিঃস্ব হয়ে সে ইন্ডিয়াতে ঢোকে। দু-সপ্তাহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে কাটানোর পর তার বাবা একটা জায়গার খোঁজ আনে। জায়গার নাম শ্রীরামপুর। সেখানে ক্ষেত্রমোহন শা নামে এক জমিদারের বাগানবাড়ি আছে। ওখানে বাগানের চেয়ে জঙ্গল বেশি। লীলাবতীরা সেই জঙ্গলে একটি ত্রিপল খাটানো তাঁবুতে কয়েকদিন কাটাল। অনেক উদ্বাস্তু বাতিল এই বাগানবাড়ির খোঁজ পেয়ে চলে এল। 'তাদের সঙ্গে জমিদারের লেঠেল বাহিনী আর পুলিশের সংঘাত লেগেই আছে। রোজ দুটো ফোর্স একত্রে আসে আর উদ্বাস্তুদের বেড়ার ঘর, তাঁবু, রান্নার ব্যবস্থা তছনছ করে চলে যায়।'

দিন পনেরো পর উদ্বাস্তুদের একটা মিটিং হয়। সেই মিটিংএ লীলাবতী উপস্থিত হয়। একজন উদ্বাস্তু নেতা বক্তৃতা দেয়। মহিলারা সামনে থাকবে, তাদের হাতে লাঠি ঝাঁটা থাকবে। তারপর পুরুষের দল। হঠাৎ পুলিশ মহিলাদের দেখে কিছু করতে পারবে না। সকলে মিলে ব্যারিকেড গড়ে। ভোর চারটে নাগাদ পুলিশ আসে। সঙ্গে জমিদারের লেঠেল বাহিনী। প্রথম সারিতে থাকা মহিলাদের উপর পুলিশ লাঠি চালাল। মহিলারাও পাল্টা লড়াই করতে লাগল লাঠি ঝাঁটা নিয়ে। লীলাবতী তার মাছকাটার বঁটিটা নিয়ে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। সেই দৃশ্য পুলিশ দেখে হতচকিত। অনেকগুলো পুলিশ তাকে মারতে লাগলো, লীলাবতী অসহায় হয়ে শুয়ে পড়ল। ওই অবস্থায় পুলিশ তাকে চ্যাংদোলা করে পুলিশ ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে এল।

লক আপের বাইরে বসা তারই বয়সী একটা ছেলে তার দিকে বিস্ময় ভাবে তাকিয়ে আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি বলল, 'আমি তোমার জামিন নিতে এসেছি।' জেল থেকে জামিন পাওয়ার পর তাদের দুজনের পরিচয়। মধুসূদন বলে, 'আমিও তোমার মতো শিকড় ছেঁড়া উদ্বাস্তু।' সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লীলাবতীর দিকে। দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মধুসূদন নিজের জীবন ইতিহাসের কথা বলে। এরপর একদিন দুজনে মিলে যায় জগন্নাথ ঘাট মন্দির, শ্রীরামপুর কলেজ, বল্লভপুর মন্দির। মধুসূদন তাকে আত্মবিশ্বাসে ভরা মেয়ে বানাবে, যাতে উদ্বাস্তু আন্দোলনে কখনো সে ভীত না হয়। সুন্দরী লীলাবতী আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে থাকে। লীলাবতীর এক ধরনের আত্মবদল হয়। সে সেই পুরোন পাবনার মেয়েটা থাকে না। সে হয়ে ওঠে জল জঙ্গলের ভিতর পরিবর্তিত একটা মেয়ে।

খুব দ্রুত কেটে গেল লীলাবতী আর মধুসূদনের জীবনের অনেকটা। লীলাবতী ভালোবাসার কথা মাকে বলে। লীলাবতীর মা সেই কথা শুনে ঠাস করে চর মারে। এরপর একদিন মধুসূদনের দাদা মেয়ে পক্ষের সম্মতি নিতে আসে। একদিকে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার আন্দোলন চলছে। ক্ষেত্র শা নত হবে, কলোনি গড়ে উঠবে। তাদের বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি প্লট পেয়ে যাবে। মধুসূদন আর লীলাবতীর বিয়ের বন্দোবস্ত চলে। দু-পক্ষই বিয়ের কেনাকাটা করে। তাদের বিবাহ হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস অতিথি হয়ে এসে লীলাবতীর বিয়েতে গান করে। তারপর সংসার সামলাতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ইতিমধ্যে কলোনি তৈরি হয়। নাম দেয় মাহেশ কলোনি। এখন সবাই প্লট পেয়ে গেছে। লীলাবতীরা পরে এসেছে বলে একটু পিছনের দিকে প্লট পেয়েছে। লীলাবতী আর মধুসূদনের একটা নিজস্ব বাড়ি দরকার। এতদিন তারা মধুসূদনের বাড়িতে কাটিয়েছে। দুজন মিলে দাদার টাকা দিয়ে একটা জায়গা কেনে। নতুন জমিতে ডোবার ধার ঘেঁষে একটা আম গাছ পোঁতে। ওপার বাংলা থেকে আসার সময় আমের আঁটি এনেছিল সে। জল শুষে আম আঁটি থেকে আম গাছ হবে। লীলাবতী দায়িত্ব নিল আমগাছ বড় করবার।

লীলাবতী সংসারে রান্না জানে না। এবার রান্না না জানলে সংসার চলবে কী করে? রান্না তাকে শিখতেই হবে। স্বামী মধুসূদনকে বলে রান্না শেখার বই কিনে আনতে। মধুসূদন কলেজ স্ট্রিট থেকে বেলা দে'র 'গৃহিণীর অভিধান' এবং 'পাকরাজেশ্বর' এনে দেন। লীলাবতী শুরু করে বেলা দে পড়ে রান্না করতে শেখা। সন্তানের সম্ভাব্য আশায় লীলাবতী কাঁথা সেলাই করে। নিজের শাড়ির পাড় থেকে রঙিন সুতো বের করে চমৎকার নকশা তোলে। সে বানায় একটা দালান বাড়ি, মাথার উপর সূর্য, সাদা বক উড়ে যাচ্ছে। লীলাবতী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এক এক করে চার পুত্রের মা হন লীলাবতী। আনন্দে তাদের সংসার চলতে থাকে। মেয়ে সন্তানের আশায় লীলাবতী কাঁথা বুনেও সে আশা পূর্ণ হয় না। মধুসূদন চাকরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। লীলাবতীর আমগাছ বড় হয়ে ওঠে। তাতে লীলাবতীর দুই ছেলে খেলা করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 126
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1011 - 1017
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কলোনির কমিটির এক পথসভা হয়। কমিটির সেক্রেটারি বিনয় দাস। সে সিলেটের লোক। 'বন্ধুগণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে একটা সমস্যায় জর্জরিত। ...তাই সরকার ঠিক করেছে প্রত্যেকের বাড়িতে পাকা পায়খানা তৈরি করে দেবে। তোমরা অতি অবশ্যই সেই মিটিঙে উপস্থিত থেকে এই পায়খানা বানানো কাজকে সার্থক করে তুলবে।'

মধুসূদনের খবরে উৎসাহ। সে লীলাবতীকে খবরের কাগজ বাড়িতে রাখার কথা জানায়। কলোনি বায়োস্কোপ দেখাবে বলে হাজির হয়। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' দেখানো হবে। সিনেমাটা দেখে কলোনির মানুষের চোখে জল আসে। সিনেমা শেষ হলে দর্শকরা বলে, 'এটা তো আমাদের কলোনির গল্প।'

কলোনিতে এবছর প্রথম দুর্গাপুজো। প্রথম দুর্গাপুজোতে সকলের বেশ উৎসাহ। চাঁদা তোলে, ঠাকুর অর্ডার দেয়, প্যান্ডেল তৈরি করে। আনন্দে কলোনির মানুষ মেতে থাকেন। এরপর একদিন ইন্দিরা গান্ধির সভায় বক্তৃতা শুনে নিজেকে পালটে ফেলে লীলাবতী। তার কথাবার্তা, শ্বাস নেওয়া, হাত নাড়া সবকিছু নকল করে। মাহেশ কলোনির পশ্চিমে রেললাইন ঘেঁষা একটা বড় মাঠ আছে। ওই মাঠেই ইন্দিরা গান্ধির সভা। সেটা ছিল জরুরি অবস্থার পর নতুন ইন্দিরার ফিরে আসার লড়াই ও তার নির্বাচনী জনসভা। দুটি লাইন লীলাবতী ও অদ্রীশের মনে দাগ আঁকে। তা হল –

মেরে প্যায়ারে ভাইয়ো আর বহিনো, হাম দেখ লুঙ্গা।

কমিউনিস্ট পার্টি একই সময় নির্বাচনী সভা করতে আসে। গান করতে ডাক পড়ে লীলাবতীর হেমাঙ্গদার। 'কমিউনিস্ট পার্টিতে কোন ইন্দিরা গান্ধি নেই'। কমিউনিস্ট পার্টিতে একটা ইন্দিরা বানালে লীলাবতী কমিউনিস্ট পার্টি করবে।

এখানে, মাহেশ কলোনিতে প্রথম লীলাবতীর বাড়িতে টেলিভিশন এলো। আর সাথে সাথে গোটা কলোনির মানুষ ভিড় জমাতে লাগল। তাই লীলাবতীর কথায় – 'টিভি আমাদের জীবনে অনেক কিছু দিয়েছে। এক যৌথতা, দুই শিল্প সংস্কৃতির বিনিময়, তিন স্মৃতি, চার বিশ্বাসযোগ্যতা। ফলে লীলাবতী থেকে অদ্রীশ বয়স মূল্যবোধ ভেদে এই সব নানা গুণে নতুন করে পরিবার বাঁধল।'

খুব কষ্ট করে লীলাবতী মাহেশ কলোনিতে একটি বেসরকারি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিল কলোনির মানুষদের শিক্ষিত করার জন্য। লীলাবতী ছাড়া সেই লাইব্রেরির কেউ সদস্য ছিল না। জীবনে চলতে চলতে হঠাৎ যেমন থেমে যায়। লীলাবতীর বড় ছেলে নকশালে যোগ দেওয়ায় লীলাবতীকে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উপন্যাসের শেষে লীলাবতীর এক করুণ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে স্টোক হয় লীলাবতীর। চার ছেলে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে নার্সিং হোমে নিয়ে যায়। বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত লীলাবতী মারা যায়।

উদ্বাস্তু-স্রোত : 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৫০ সালে বাগেরহাট অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তখন পর্যন্ত দাঙ্গা সেই রকম ভাবে ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। এরপর কলকাতা এবং শহরতলিতে মুসলমানদের উপরে আক্রমণের সংবাদ গিয়ে পৌঁছায় পূর্ববঙ্গে। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন শুরু হয় এবং তারা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করে।

> "প্রধানত আতঙ্কের কারণে চলে আসছিল হিন্দুরা; কিন্তু সে আতঙ্ক কাল্পনিক ভয় বা রটানো গুজব নয়। বড়ো আকারে দাঙ্গা বা সংগঠিত কোন আক্রমণ না থাকলও হিন্দুদের প্রতিদিনের জীবনের লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছিল। তারা বিশেষ করে ভয় পাচ্ছিলেন মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। পথঘাটে মেয়েদের ওপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটছিল। এছাড়া হিন্দুর ধর্মস্থান এবং ধর্মীয় উৎসবের ওপর আক্রমণও।"[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 126
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1011 - 1017
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অন্যদিকে কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকেও অল্প সংখ্যক মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলে যেতে শুরু করে। এরপর একের পর এক হিন্দু নিপীড়ন শুরু হয়। প্রতিহিংসার ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সীমানার দুই দিকেই দাঙ্গা, খুন ও জখম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে।

> "১৯৪৭-১৯৫১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ৩৫ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। নেহেরু লিয়াকত চুক্তির পর তাদের একাংশ ফিরে গেলেও, একদল পরে আবার চলে আসেন। তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ১৯৫০এর পর ১১ লক্ষ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যান, তাদের মধ্যে ৭.৫ লক্ষ আবার পরে ফিরে এসেছিল।"[২]

উদ্বাস্তু স্রোত এখানে থেমে থাকেনি। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, নোয়াখালির সমস্ত হিন্দু মানুষদের এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য করে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে আশ্রয় নেয়। তারপর রাস্তার ফুটপাত, আর উদ্বাস্তুদের আত্মনির্ভর শীলতার এক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শান্তিনগর, কল্যাণী, মাহেশ কলোনি।

বাস্তুহারা ও বাস্তুছাড়া : পূর্ববাংলা থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে হিন্দুদের চলে আসা শুরু স্বাধীনতার প্রায় এক বছর আগে ১৯৪৬এ নোয়াখালি দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। আর যে সব অঞ্চলে হাঙ্গামা হয়নি সেখানে ছিল গভীর উদ্বেগ আর আতঙ্ক। সিলেটের বীণাপাণি রায়চৌধুরী সেই অবস্থার কথা লিখেছেন।

> "আমাদের গ্রাম ছিল হিন্দু প্রধান। হিন্দুরা বেশিরভাগই জমিদার আর মুসলমানরা চাষি। সম্পর্ক খারাপ ছিল না। কিন্তু দেশভাগ ঠিক হয়ে যাওয়ার পরই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর কিছু মুসলমান বলতে থাকে, পাকিস্তানটা হতে দাও, তারপর হিন্দুদের ব্যবস্থা হবে। দারুন প্যানিক তখন হিন্দুদের মনে। স্বাধীনতার দিনটা সকলেই বিষণ্ণ ছিলেন; কী হয়, কী হয় ভাবে। এরপর কয়েকদিন কাটলে হিন্দু বাড়িতে চুরি ডাকাতি হতে লাগল। গ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য তাকে পাওয়া যায়।"[৩]

প্রধানত আতঙ্কের কারণেই চলে আসছিল হিন্দুরা। তাদের বিশেষ করে ভয় ছিল মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া স্বার্থান্বেষী লোকেরা গরিব হিন্দু চাষিদের জমি হাতিয়ে নেবার জন্য চাপ দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। সতীনাথ ভাদুরির 'গণনায়ক' গল্পে আমরা আগে তার প্রমাণ পেয়েছি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছে দেশত্যাগী পরিবারটি এক হিন্দুকেই বাড়ি জমি সব বিক্রি করে দিচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দুই পারের হিন্দু ও মুসলমানরা বাড়ি বিনিময় করে নিয়েছিল।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ করা গেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে শহরের ফুটপাতে, ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় জুটল বাস্তুহারাদের। তারপর পুণর্বাসন দপ্তরের কাছ থেকে এক টুকরো খবরের কাগজ নিয়ে শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার প্রতীক্ষা। কেউ কেউ চিড়ে, গুড় আর খোল সংগ্রহ করে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে। কোথাও বা উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা লক্ষ করা গেছে। এরকম একটি উপন্যাস 'লীলাবতী'। পূর্ববঙ্গে ভিটে মাটি জমি বিক্রি করে দিয়ে এপার বাংলায় বেঁচে থাকার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে। কখনো নিজের অধিকার বা সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনির মানুষের জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে, কখনো বা জেলে যেতে হয়েছে।

ইসমৎ-মান্টো ও ওপারের সীমানা : ইসমৎ চুগতাই পড়ে লীলাবতী ভক্ত হয়ে ওঠেন। সে তার জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকাকে আবিষ্কার করেছিল। যার মধ্যে ছিল মতামতে অনড় ও নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। যার সঙ্গে লীলাবতীর এক বিশেষ ধরণের মত গড়ে ওঠে। মানুষ হিসাবে ইসমৎ ছিলেন প্রগতিশীল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 126
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1011 - 1017
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমি পিতাজিকে বলেছি আমরা কোন বিশেষ ধর্মেই বিশ্বাস করি না। এখন তোমাদেরও সেই একই কথা বলছি। আমাদের কোন ধর্ম নেই। সব ধর্মই এক ভগবানের দান, সব ধর্মই সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে এক বিশেষ উপহার। তাকে কেউ গড নলে। তোমরা তাঁকে আল্লা বলে জানো।"[৪]

ইসমৎ চুগতাইয়ের বেশিরভাগ গল্পের মধ্যে ছিল দেশাত্মবোধ, তার বিশ্বাস নারীদেরকে স্বাধীন ভাবে মর্যাদা দেওয়া, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি। দেশাত্মবোধ সম্পর্কে জাগরণ। এই বিষয়গুলি লীলাবতীর মনে বিশেষভাবে দাগ আঁকে। ইসমৎ চুগতাইয়ের 'সাচ্চা দায়' গল্পে (অনুঃ তপতী সান্যাল) এক উদ্ধৃতি পাই, -

> "আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পাক। যাকে মন ধরে বিয়ে করুক।"[৫]

যখন গোটা দেশ জুড়ে হানাহানি, দাঙ্গা, একে অপরের উপর অত্যাচার; তখন ইসমৎ শান্তির বার্তা ছড়ায়। সম্প্রীতির কথা বলে। এছাড়া 'সাচ্চা দায়', 'আগন্তুক', 'বাচ্চা' ইত্যাদি গল্প পড়ে লীলাবতী মুগ্ধ হয়ে ওঠে। দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটায়। তাকে নতুন দিশা দেয়।

সাদত হোসেন মান্টো ১৯০২ সালে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের সময় চাকরি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয় পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁর 'টেক টোবা সিং' গল্পে প্রধান চরিত্র লাহোরের উন্মাদাশ্রমের এক পাগল বিষন সিং। সে জানে না তার গ্রাম টেক টোবা সিং কোন গ্রামে পড়ল। কেউ জবাব দিতে পারে না। এর মধ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছে পাগলদেরও যার যেখানে দেশ সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই অনুসারে বিষন সিংকে পাঠানো হবে ভারতে। কিন্তু সে রাজি নয়। সে তার গ্রাম 'টেক টোবা সিং' ফিরে যাবে। শেষ পর্যন্ত সীমান্তের কাঁটাতারে দাঁড়িয়ে পা ফুলে স্নায়ু অবশ হয়ে মারা গেল।

"এই হচ্ছে আসল লেখক। যে নীচুতলার মানুষদের নিয়ে একটা ভাবনায় দেশভাগ ভাবতে পারে", যার ভিতরে চমৎকার নিষ্ঠুর হিউমারের সঙ্গে সঙ্গে একটা পার্টিশান সাইকোলজি আছে যা খুব জরুরি বিষয়। তাই 'ঠাণ্ডা গোস্ত' থেকে 'খোল দো' চমকে চমকে লীলাবতীর বিশেষ পছন্দ 'টেক টোবা সিং'। লীলাবতীকে মান্টোর বই আকর্ষণ করে তোলে। স্মৃতিকথা ছাড়া তার আর বিশেষ সৃষ্টিশীল লেখার ছাপ নেই।

লীলাবতী চরিত্র : লীলাবতী একটা সাধারণ মেয়ে। দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলা থেকে ভারতবর্ষে ঢোকে। তখন তার বয়স ষোলো বছর। তারপর শিয়ালদহ স্টেশনে দু'সপ্তাহ কাটানোর পর লীলাবতীর বাবা অবশেষে একটা মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে পান। তাদের ঠাই হয় শ্রীরামপুরে। সেখানে ক্ষেত্রমোহন সাহা নামে এক জমিদারের বাগানবাড়ি আছে। সেখানে লীলাবতীরা ত্রিপোল খাটানো তাঁবুতে উদ্বাস্তু বেশে আশ্রয় নেয়। তাদের সঙ্গে আরও অনেক উদ্বাস্তু সেখানে থাকতে থাকে। জমিদারের লেঠেল বাহিনী ও পুলিশ তাদের ওপর অত্যাচার চালায়। লীলাবতী বটী নিয়ে পুলিশের দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশের লাঠির আঘাতে লীলাবতী মাটিতে অচেতন হয়ে পড়ে যায়। এখানে লীলাবতীর প্রতিবাদসত্ত্বা ও সাহসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। মধুসূদন নামে এক যুবক জেল থেকে লীলাবতীকে মুক্তি করে আনে। মধুসূদনের সঙ্গে লীলাবতীর এক মধুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর দুজনে বিবাহ করে। সরকার কলোনীর মানুষদের থাকার জায়গা দেয়। লীলাবতীরা জায়গা পেয়ে যায়। মধুসূদন আর লীলাবতী দুজন মিলে ঘর তৈরি করে। তারপর লীলাবতী প্রথম সন্তানের জন্ম দেয়। নাম রাখে দেবাশিস। দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের আশায় লীলাবতী কাঁথার পাড়ের নকশা তৈরি করে। কিন্তু সেই আধা তাদের পূর্ণ হয় না। এক এক করে লীলাবতী চার পুত্রের মা হন। লীলাবতী বহু গুণে সমন্বিত এক নারী। সে যেমন দেখতে সুন্দরী তেমনি রান্না এবং সেলাইয়ে এতটাই দক্ষ যে তার দ্বিতীয় জুড়ি মেলা ভার। মাহেশ কলোনীতে লীলাবতীর বাড়িতে প্রথম টেলিভিশন এল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে গোটা কলোনীর মানুষ ভিড় জমাতে লাগল লীলাবতীর বাড়িতে। সেই সময় বিনোদনের চাহিদা ছিল প্রচুর। সাহিত্যের প্রতি তার ছিল অগভীর ভালোবাসা। নিজে পয়সা জমিয়ে রামায়ণের বই কিনে সে মাঝে মাঝে পড়ে। এছাড়া বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীল শীর্ষেন্দু এমনকি অদ্রীশ বর্ধনের সায়েন্স ফিকশন পর্যন্ত সে পড়ে ফেলেছিল। তাই অদ্রীশ বর্ধনের নাম অনুসারে লীলাবতীর ছোটোছেলের নাম রাখে অদ্রীশ। খুব কষ্ট করে লীলাবতী মাহেশ কলোনীতে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লীলাবতী ছাড়া সেই লাইব্রেরীর কেউ সদস্য ছিল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 126
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1011 - 1017
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

না। মানুষের স্বার্থে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করলেও বই পড়ার প্রতি আগ্রহ তাদের ছিল না। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে স্ট্রোক হয়। চার ছেলে ধরাধরি করে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। ডাক্তার সমস্ত রকম চিকিৎসা করে। এরপর একদিন দুপুরে লীলাবতী মারা যায়। লীলাবতীর মৃত্যুকে ঘিরে সেই দিন রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের মারামারি চলে। পরিশেষে বলতে পারি লীলাবতী এক মহিয়সী মহিলার গল্প। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যে নারীকে অবহেলিত করা হয়। পিছিয়ে থাকা বাড়ির চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ সেই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নারীর প্রতিবাদ : অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নারীর অধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা। মূলত বৃটিশরাজ ও পশ্চিমী সংস্কৃতি রক্ষার সূত্রপাতে নারী আন্দোলনের উদ্ভব। ভারতে নারী আন্দোলনের ধারাকে উপলব্ধি করার জন্য উনিশ শতকের নবজাগরণ নারী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা যেহেতু ছিল কৃষিভিত্তিক ও সামন্ততান্ত্রিক যেখানে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নারীকে গণ্য করা হত। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুকন্যা হত্যা প্রচলিত ছিল। আর সমস্ত ধরনের স্বাধীনতা থেকে মহিলারা বঞ্চিত ছিল।

বুর্জোয়া সমাজের যুক্তিবাদীতা ও মানবতা ভারতীয়দের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উন্নতি, নারীর অধিকার, উন্নয়ন, শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

> "ভারতীয় সমাজে লিঙ্গজনিত বৈষম্য একেবারেই মূলে প্রোথিত। ধর্মীয় পুস্তক ও সংস্কার এই লিঙ্গজনিত বৈষম্যকে আরো সুচারু রূপ দেয়। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক ভূমিকাকে স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করা হয়।"[৬]

লীলাবতী উপন্যাসে লীলাবতী আসলে এক মহিয়সী মহিলা। পুরুষের দৃষ্টিকোন থেকে যে নারীকে অবহেলা করা হয়য়। পিছিয়ে থাকা বাড়ির চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ সেই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। 'মধুসূদন তাকে আত্মবিশ্বাসে ভরা মেয়ে বানাবে, যাতে উদ্বাস্তু আন্দোলনে কখনও সে ভীত না হয়। সুন্দরী লীলাবতী আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে থাকে। লীলাবতীর এক ধরনের আত্মার বদল হয়। সে সেই পুরোন পাবনার মেয়েটা থাকে না। সে হয়ে ওঠে এই জল-জমিনের ভিতর পরিবর্তিত একটা মেয়ে।'

উপসংহার : সমগ্র উপন্যাসটিতে লীলাবতীকে ঘিরে জাল বিস্তার ঘটে। লীলাবতী এই উপন্যাসে হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র। আর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা ও চরিত্র। যেখানে লীলাবতী চরিত্রের অনুপস্থিত ঘটেছে সেখানে অন্য চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসটি গতিময়তা পেয়েছে এবং লীলাবতী চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথমে দেশভাগের এক করুণ কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এসেছে লীলাবতীর পারিবারিক জীবনের এক ভয়াবহ ছবি। দেশভাগের যন্ত্রণার কারণে উঠে আসতে হয়েছে এপার বাংলায়। উঠে আসার সময় একটি আমের আঁঠি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ভারতে রোপন করবে বলে। সেই আমের গাছের মতোই শাখা প্রশাখা বিস্তার করে জটিল হয়ে ওঠে লীলাবতীর জীবন। দেশভাগ, মানে ভিটেমাটি ছেড়ে উঠে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিবার প্রকাশিত হয় লীলাবতীর সংসার জীবনের মধ্যে দিয়ে। আমাদের মনে পরে যায় 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' সিনেমার বঙ্গবালা চরিত্রটির কথা। বাংলা দেশের আত্মা যখন এক উদ্বাস্তু নারীর মতো কলকাতার রাজপথে ঘুরে বেড়ায়।

এই উপন্যাসটি প্রধানত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি হল স্মৃতি। উপন্যাসটি প্রধানত পপুলার সোসিও কালচারাল হিস্টরি মেমরি পলিটিকস নিয়ে কাজ করা হয়েছে। উপন্যাসের একটা বড় দিক হল ইতিহাসের ঘটনাকে এদিক ওদিক করে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হল আবেগ। তার সঙ্গে কিছু আশ্চর্যতা রয়েছে। এই উপন্যাসে আবেগ একটা বড় ভূমিকা পালন করে। যা আমরা লীলাবতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে খুঁজে পাই। এভাবেই সমাজমনস্তত্ত্বের সন্দর্ভে লীলাবতী বলে গেছে একটা রাজনৈতিক ঘটনার ভিতর থেকে জন্ম নেওয়া একটা বর্গের কথা, যাদের নাম উদ্বাস্তু। স্থান কালের বেড়া টপকে যাদের শুধু দেশ থাকে, থাকে না কোন রাষ্ট্রীয় পরিচয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 126
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1011 - 1017
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপন্যাসটি মূলত দেশভাগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দেশভাগের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে কীভাবে দুঃখযন্ত্রনা নেমে এসেছে তা এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। কিভাবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। ক্ষুধার তাড়নাই রাস্তা ফুটপাতে অনায়াসে মরতে হয়েছে। কাউকে বা পুলিশের গুলি খেতে হয়েছে। এরকম একটি উপন্যাস হল লীলাবতী। দেশভাগের কারণে এপার বাংলায় চলে আসতে হয়, তারপর শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয়। কিছুদিন যাওয়ার পর শ্রীরামপুরে ক্ষেত্র সাহা নামক এক জমিদারের বাড়িতে আশ্রয়। তারপর জমিদার ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত। পুলিশের লাঠিতে মহিলাদের পদাশ্রয়। এখানেও শেষ পর্যন্ত থেমে থাকেনি। 'প্রথম সাড়িতে দাঁড়ানো মহিলাদের উপর পুলিশ লাঠি চালালো। সেই মার সহ্য করে মহিলারাও পালটা লড়াই করতে লাগল লাঠি-ঝাঁটা নিয়ে। ...পুলিশ অনবরত সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মারছে। মার যখন কপাল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে, তখন লীলাবতী বটী হাতে সামনের সাড়িতে ছলে গেল।'

এখানে উদ্বাস্তু থেকে উঠে আসা কলোনী মানুষের আন্দোলন থেমে থাকেনি। তাদের নিজেদের অধিকারকে আদায় করে নিতে হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রাম মানুষের কাছে মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক, যা মানুষকে শেষ পরিণতি এনে দেয়। তাই দেশভাগের গল্প হিসেবে এই উপন্যাস যথেষ্ঠ প্রাসঙ্গিক।

Reference:

১, বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, উদ্বাস্তু, পৃ. ১৪-১৫
২, চৌধুরী, প্রণতি, অকেশনাল পেপার ৫৫, CSSS, পৃ. ৪
৩, বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, অনুষ্টুপ, দেশভাগ দেশত্যাগ, ২০১৬ কলকাতা, পৃ. ৬৮
৪, বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাঃ), দে'জ পাবলিশিং, ভেদ-বিভেদ (২য় খণ্ড), ১৯৯২ কলকাতা, পৃ. ৪৯৪
৫, তদেব, পৃ: ৪৮১
৬, বসু, রাজশ্রী চক্রবর্তী বাসবী, উর্বী প্রকাশন, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, ২০১৪ কলকাতা, পৃ. ৮১

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

বিশ্বাস অদ্রীশ, ৯ ঋ কা ল, লীলাবতী, ২০১৮ কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ :

বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দ্র (সম্পাঃ), দে'জ পাবলিশিং, ভেদ-বিভেদ (২য় খণ্ড), ১৯৯২ কলকাতা
চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দেশবিভাগ – পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, ২০১৮ কলকাতা
কুণ্ডু চন্দন কুমার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ – বাংলা উপন্যাসের দর্পণে, ২০১২ কলকাতা

গবেষণা প্রবন্ধ :

চৌধুরী প্রণতি, অকেশনাল পেপার ৫৫, CSSS